তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

জোর পড়ুক কর্মমুখী শিক্ষায়

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

মো. মোর্ত্তুজা আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এবার এসএসসিতে পরীক্ষা দিয়েছিল কমবেশি ১৩ লাখ পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে সাড়ে ১১ লাখ। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসের হার থেকে জানা যায়, ১৯৯১ সালে পাসের শতকরা হার ছিল ৩১.৭৩ শতাংশ। এরপর প্রতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে এবং পাসের হারও বেড়েছে। সারাদেশে এসএসসিতে পাসের হার ৮৮.৭০ শতাংশ, মাদ্রাসা ৮৮.২২ শতাংশ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৩.১১ শতাংশ। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষার ভিত যত মজবুত হবে জাতির উন্নয়নও তত টেকসই হবে। গুণগত শিক্ষাই একটি জাতির জীবন এবং টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। এ কারণে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাই হলো একজন শিক্ষার্থীর মূল ভিত্তি, যার ওপর তার উচ্চশিক্ষা এবং দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। একটা সময় ছিল যখন মাধ্যমিকে কেউ পাস করলে সবাই তাকে দেখতে যেত। এখন যুগ বদলাচ্ছে, এখন আর পাস করলে কেউ দেখতে যায় না বরং কেউ ফেল করলে সবাই তাকে দেখতে যায়।

আমরা পাসের হার বৃদ্ধি করতে পেরেছি; কিন্তু মান কি সে হারে বাড়াতে পেরেছি? শিক্ষার হার বৃদ্ধি যেমন কাম্য, তার থেকে বেশি কাম্য মান বৃদ্ধি। সারাদেশে এসএসসি ও সমমানের পাসের হার বরাবরের মতোই এ বছরও ঊর্ধ্বগামী। ভাবতে অবাক লাগে, বছর বছর এত মেধার বিস্ফোরণ কোথা থেকে হচ্ছে? এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, দেশে শিক্ষার হার বেড়ে যাচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের মেধাও বেড়ে যাচ্ছে। বরং উল্টোটাই হচ্ছে। শিক্ষার মান দিন দিন কমছে আর নম্বর পাওয়াটা সহজ হয়ে যাচ্ছে। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় চারটি ইউনিটে গড় পাসের হার মাত্র ১৬ শতাংশ। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই লজ্জাজনক চিত্র জগন্নাথ, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও।

দেশে বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯২টি, যার মধ্যে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদ্যমান। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা নির্ধারিত; কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা নির্ধারিত নয়। জোগান থাকা সাপেক্ষে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র ভর্তি করে থাকে। কোনো পূর্ব গবেষণা ছাড়াই শুধু রাজনীতিক বিবেচনায় একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়ার ফলে, এসব

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির জন্য পাসের হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। মান বজায় রাখতে গিয়ে কোনো কারণে যদি পাসের হার কমে যায়, তাহলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির হারও অনেক কমে যাবে এবং এসব বিশ্ববিদ্যালয় তখন আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য রাখার জন্য শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে। এই একই কারণ প্রযোজ্য প্রাইভেট মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও। মান বজায় রেখে ভর্তি পরীক্ষা নিলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বাদ পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই এখানেও মানের সঙ্গে আপস করতে হয়। এখন টাকা থাকলেই যে কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, কৃষিবিদ, উকিল হতে পারে, যা উন্নত বিশ্বে কল্পনাও করা যায় না। উন্নত বিশ্ব কখনও মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলোর মানের সঙ্গে কোনো আপস করে না। কারণ এসব বিষয় সরাসরি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। সব বিষয়ের সঙ্গে এক্সপ্রিমেন্ট করা গেলেও মানুষের জীবন নিয়ে এক্সপ্রিমেন্ট করা যায় না। সুতরাং ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের মান হতে হয় অত্যন্ত উঁচুমানের। অন্যথায় কী পরিলক্ষিত হয় তার নজির সম্প্রতি আমরা পেয়েছি রডের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহার। শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করলে এ ধরনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটতে থাকবে। আমরা দেশের সম্পদ তৈরি করার পরিবর্তে দেশের বোঝা তৈরি করছি কি-না ভেবে দেখা দরকার।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের মতে, 'উচ্চশিক্ষা সবার জন্য না। উচ্চশিক্ষা শুধু মেধাবীদের জন্য।' শুধু যারা মেধাবী তারাই অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল এবং পিএইচডি করবে। অমেধাবী ও স্বল্প মেধাবীদের জন্য দরকার কর্মমুখী শিক্ষা। যে পদ্ধতি উন্নত বিশ্বে প্রচলিত। এসব কর্মমুখী শিক্ষা সাধারণত ছয় মাস, এক বছর বা দুই বছর মেয়াদি হতে পারে। এ ধরনের কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে থাকতে হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, কৃষি, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক, ওয়েল্ডিং, ড্রাইভার, কারপেন্টার, রঙ শিল্প, লেদ, হাতের কাজ, টাইপিং, কম্পিউটার মেরামত, টিভি, ফ্রিজ, এসি মেরামত ইত্যাদি। এসব শিক্ষা হাতে-কলমে শিখে সরাসরি একজন ছাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে। কর্মমুখী শিক্ষার একটা সুবিধা হলো সরকারকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হয় না বরং শিক্ষার্থীরাই নিজেদের কাজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকে অর্থাৎ নিজেরাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশের অভিভাবকদের মূল উদ্দেশ্যই থাকে তার ছেলেমেয়েকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জজ-ব্যারিস্টার, এমএ পাস, বিএ পাস করাবে। এত এত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এমএ পাস, বিএ পাস করে যদি চাকরি না পেয়ে বেকার বসে থাকতে হয়, তাহলে এসব পড়ালেখা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আর আমাদের দেশে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর না দিয়ে শুধু উচ্চশিক্ষার ওপর জোর দিতে গিয়ে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়েও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেই হবে না, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষকেরও ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চশিক্ষা আসলেই একটি ব্যয়বহুল বিষয়। শুধু আমাদের দেশে নয় উন্নত বিশ্বেও উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল। এ কারণে আমাদের দেশে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের জন্য সরকারকে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। উচ্চশিক্ষার ওপর চাপ কমিয়ে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিলে সরকারকে উচ্চশিক্ষায় এত ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। কর্মমুখী শিক্ষার আরও একটি সুবিধা হলো, এখানে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো কারণ নেই। দরকার পড়বে না নোটবই, গাইড বইয়ের। দরকার পড়বে না কোচিং ও প্রাইভেটের। এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো হাতে-কলমে শিক্ষা। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো ভালো মানুষ তৈরি করা, সার্টিফিকেট অর্জন নয়। তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য এ প্লাস নয়, শিক্ষার মানের ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত।

amm203@gmail.com